আজকের কাগজ

তারিখ 12 AUG 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

29

(২৪)

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস প্রতিকারের উপায় কি

হারুন–অর–রশিদ

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নতুন করে সহিংস তৎপরতা ছড়িয়ে পড়ছে। প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠনের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের জের হিসেবে বন্ধ হচ্ছে একের পর এক কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৩ টিই বন্ধ হয়ে গেছে। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি বন্ধ হলেও, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বহুদিন ধরে বন্ধ। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খোলা সম্ভব হলেও, শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ বলতে যা বোঝায় তা আদৌ ফিরে আসেনি, বরং যে কোন সময় পুনরায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। হিসেব অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত দেশে এভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬–এ দাঁড়িয়েছে। এ লেখা বের হওয়ার মধ্যে হয়তো সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে।

এভাবে উপর্যুপরি শিক্ষা–প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। পরীক্ষাসমূহ নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হতে পারছে না, বার বার পিছিয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে সেশনজট, যার মাত্রা দিনে দিনে বেড়েই চলছে। সেশনজট থেকে নিষ্কৃতি লাভের লক্ষ্যে গৃহীত বিশেষ পদক্ষেপসমূহ ভেস্তে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের বয়স চাকুরীর সর্বোচ্চ সীমা ছুঁই ছুঁই করছে– কারো কারো এই সীমা পেরিয়ে গেছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে শিক্ষিত বেকার–যুবকদের তালিকা। সীমিত আয়, স্বল্প বেতনভুক নিম্নবিত্তদের ওপর শিক্ষা কার্যক্রম বার বার বিঘ্নিত ও পিছিয়ে পড়ার প্রভাব অত্যন্ত বিরূপ। এর ফলে, কারো কারো পক্ষে তাদের সন্তান–সন্ততিদের শিক্ষা জীবন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না, বাধ্য হয় মাঝ পথে ছেড়ে দিতে। শিক্ষা–প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেলে শিক্ষকগণ যে স্বস্তি পান, আরামে থাকেন এরূপ ভাবা আদৌ ঠিক নয়। ছাত্র, ক্লাস রুম, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী নিয়ে যেখানে শিক্ষকতা, সেখানে এসবের অনুপস্থিতি এ পেশায় নিয়োজিতদের জীবনকে অন্তঃসার শূন্য করে তোলে। অতএব, কি ছাত্র, কি শিক্ষক, কি অভিভাবক কারো জন্য অনির্ধারিতভাবে শিক্ষা–প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়াটা কিছুতেই অনুকূলে নয়। সর্বোপরি, আমাদের মত একটি অনুন্নত, পশ্চাৎপদ, দরিদ্র দেশের ক্ষেত্রে এর ফলাফল খুবই মারাত্মক। কেননা, শিক্ষা ব্যতীত আমাদের জাতীয় অগ্রগতি সাধনে আর কি–বা উপায় আছে– সে শিক্ষা যত ত্রুটিযুক্তই হোক না কেন।

এতদিন শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য স্বৈরাচারী সরকারকেই দায়ী করা হত। স্বৈরাচারী সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষাঙ্গনের অবস্থার উন্নতি ঘটবে, সুস্থ ও স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ–পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে অনেকেরই এরকম ধারণা ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। এরশাদের পতন ঘটাতে যে ছাত্রসমাজ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করল, গণতন্ত্রের পথে নতুন অভিযাত্রার এই সন্ধিক্ষণে তারাই যখন পুনরায় পারস্পরিক আত্মহননে লিপ্ত হয়, সন্ত্রাসী পন্থার আশ্রয় নেয় এবং তাদের সহিংস তৎপরতার কারণে একের পর এক শিক্ষা–প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়, তখন এ অবস্থা অনেকেই হতাশ করবে সেটাই স্বাভাবিক।

যদিও আমার মনে হয়নি যে, স্বৈরাচারী সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী ঘটনা বন্ধ হয়ে যাবে। এ কথা ঠিক, এরশাদ স্বৈরাচার কর্তৃক অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা দখলের পর জনগণের রায় নিয়ে কোনক্রমে বৈধতা অর্জন করতে সক্ষম না হয়ে তারা ন'বছর ক্ষমতাসীন থাকাকালীন রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে নানাভাবে সন্ত্রাসী তৎপরতায় মদদ যুগিয়েছে, পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। তবে, শুধুমাত্র এরশাদ স্বৈরাচারের ক্ষমতাসীন থাকা না থাকার ওপর সন্ত্রাসী তৎপরতার অস্তিত্ব নির্ভরশীল নয়। তাই যদি হত তাহলে, অনেকের ধারণা অনুযায়ী, এরশাদ সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এরও অবসান ঘটত।

সন্ত্রাস হচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান অবলম্বন। গণতন্ত্রহীন পরিবেশ এর উর্বর ক্ষেত্র। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ধরলে দেখা যাবে চার দশকেরও অধিক সময়কালের মধ্যে খুব কম সময় এদেশের জনগণ গণতন্ত্রচর্চার সুযোগ পেয়েছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ–উত্তরকালে আমাদের জাতীয় জীবনে গণতন্ত্র চর্চার একটি অপূর্ব সুযোগ এলেও তা সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি এবং এর আয়ুষ্কাল ছিল খুবই স্বল্প (১৯৭২–'৭৪)। অতএব, বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক সরকারের আমলে নিজেদের শাসন–শোষণের স্বার্থেই শাসক গোষ্ঠীকর্তৃক সন্ত্রাস–সহিংসতা উৎসাহিত হয়ে, প্রশ্রয় লাভ করে আসছে। এরশাদের দীর্ঘ ন'বছরের স্বৈরশাসনামলে এ ক্ষেত্রে বহু মাত্রা সংযোজিত হলেও, একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এ হচ্ছে একটি সামগ্রিক রূপ বা অবস্থা যা বহুদিনে সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা–প্রতিষ্ঠানে প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের মধ্যে প্রভাব বলয় বৃদ্ধির প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটি সাধারণ রূপ লাভ করছে। এবং সেটাই স্বাভাবিক। তবে আশঙ্কার ব্যাপার হল, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহিংস রূপ লাভ করায় শিক্ষাঙ্গনে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটছে, একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়–কলেজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। (অবশ্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ কোন কোন শিক্ষা–প্রতিষ্ঠানে একটি মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র তৎপরতার ফলে অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে, এমনকি কোথাও তা মারাত্মক আকার ধারণ করছে)। প্রতিদ্বন্দ্বী একটি ছাত্র সংগঠন ছাত্রী মিছিলে হামলা, অধিকতর সহিংসতার আশ্রয় নেয়া ইত্যাদি সত্ত্বেও ভাল ফল পাওয়ায় অন্যরাও যদি এপথে প্রলুব্ধ হয় তা কি খুবই অস্বাভাবিক হবে? সে রকম ঘটনা ঘটছে বলেও মনে হয়। ছাত্র–তরুণ সম্প্রদায়ের নিকট এসব 'পুরুষত্বের নিদর্শন হিসেবেই অধিকতর বিবেচিত হচ্ছে, খুব একটা ঘৃণিত হচ্ছে বলে মনে হয় না। একটি বিশেষ এক মনস্তত্ত্ব তা অবক্ষয় বা অন্য যা কিছুই বলা হোক না কেন। কিন্তু এ পথ তো একটি সুস্থ রাজনীতির ধারা হতে পারে না। শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান পরিস্থিতি কাউকে উদ্বিগ্ন না করে পারে না। একমাত্র ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী ও তাদের দোসররা বাদে, কেননা এ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে তাদের অনুকূলেই যায়। এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সুযোগ পেলে এরা তার সদ্ব্যবহার করবে সেটা অবধারিত। যাহোক, বর্তমান অবস্থা দেখে গণতন্ত্র প্রত্যাশী অনেকের মনেই প্রশ্ন : দীর্ঘ আন্দোলন–সংগ্রামের পর গণতন্ত্র চর্চার যে সুযোগটি জাতি লাভ করেছে তা কি আবারও নস্যাৎ হয়ে যাবে? শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান পরিস্থিতি প্রতিকারের উপায় কি?

সার্বিক পরিত্রাণ লাভে আমাদের সম্মুখে কোন শর্টকাট উপায় বা সহজ–সরল পথ খোলা আছে বলে মনে হয় না। এরশাদের পতন হয়েছে বলে দীর্ঘ দিনে গড়ে ওঠা স্বৈরাচারী ব্যবস্থারও অবসান ঘটেছে এ কথা কি বলা যাবে? অগণতান্ত্রিক আচার–আচারণ, দৃষ্টিভঙ্গি, মন–মানসিকতার কি এত দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব? এ জন্য

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন গণতন্ত্র চর্চা। গণতন্ত্রই পারে সন্ত্রাস–সহিংসতা অপ্রয়োজনীয় ও অকার্যকরী করতে। দেশে আজ যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার শুভ সূচনা ঘটেছে তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা প্রয়োজন, এর লালন করা ও এগিয়ে নেয়া প্রয়োজন, প্রয়োজন সমগ্র সমাজ দেহে এর গতিসঞ্চালন, প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, একটি গণতান্ত্রিক সমাজ–রাষ্ট্র কায়েমের সঙ্গে শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ–পরিস্থিতি নিশ্চিতকরণ নিবিড়ভাবেই সম্পর্কিত।

তবে ঘটনার স্বতঃস্ফূর্ততা বা অনিবার্যতার ওপর নির্ভর করে চুপচাপ বসে থাকলে চলে না। পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে, এর উন্নতি বিধানে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। দেশের শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসী তৎপরতা ও দ্রুত অবনতিশীল পরিস্থিতি রোধে সরকারের মুখ্য ভূমিকা পালন করা দরকার। আইন–শৃঙ্খলা রক্ষা এবং 'নাগরিকের জীবন ও সম্পত্তির নিশ্চয়তা বিধান প্রত্যেক সরকারের আশু দায়িত্ব ও কর্তব্য। পক্ষপাতিত্বহীন বা কোনরূপ বৈষম্য না করে সরকারকে এ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। অর্থাৎ এ জন্য প্রয়োজন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন বা সরকারী ছত্রচ্ছায়ায় অন্য কেউ অবৈধ অস্ত্র রাখলে, সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত হলে দোষণীয় কিছু নয়, কিন্তু প্রতিপক্ষের বেলায় তা বেআইনী, দোষণীয় হবে– এরূপ দ্বৈতনীতি একই সময় একই স্থানে চলতে পারে না। তাহলে, একদিকে যেমনি জনগণের দৃষ্টিতে সরকারের কৃতিত্ব নষ্ট হয়, অন্যদিকে তেমনি সরকারও তার শাসন করার আইনগত ও নৈতিক শক্তি হারায়। অবৈধ অস্ত্রধারী, সন্ত্রাসী যে দলের, যে মতের, যে বর্ণেরই হোক না কেন, আইনের প্রয়োগ সমান হতে হবে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আইন–শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যাতে অহেতুক রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মুক্ত থেকে নির্বিঘ্নে দায়িত্ব পালন করতে পারে তাও সরকারকর্তৃক নিশ্চিত করা। কথাগুলো নতুন কিছু না হলেও বর্তমান বিএনপি সরকারকে এসব গভীরভাবে ভেবে দেখতে ও উপলব্ধি করতে হবে। ঢাকা, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন যখন পুলিশের নিষ্ক্রিয় উপস্থিতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয় বা একই প্রক্রিয়ায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের হোস্টেল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সঠগঠনকে হটিয়ে দলীয় পতাকা উড়িয়ে দেয়, তখন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের অঙ্গীকারের ওপর আস্থা রাখি কিভাবে? অন্যভাবে, যে সব হল বা ছাত্রাবাসে সরকার বিরোধী ছাত্র সংগঠনের প্রাধান্য বেশী, চিহ্নিত সে সব হল বা ছাত্রাবাসে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের নামে যখন উপর্যুপরি পুলিশী তল্লাশি চলে, অথচ একই সময় সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনের প্রাধান্যশীল হল বা ছাত্রাবাসগুলোতে সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি সত্ত্বেও সেগুলোতে পুলিশী তল্লাশি না চালানোর ফলে সরকারের নিরপেক্ষ ভূমিকা সম্বন্ধে প্রশ্নের উদ্রেক করে। এ কথা আদৌ ভাবার অবকাশ নেই যে, সরকার বিরোধী ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত হওয়ার বা সন্ত্রাসী পন্থায় হল দখলের সুযোগ থাকবে, আর সরকার বা সরকারী ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা হবে নির্লিপ্ত থাকা। যা বলা দরকার তা হচ্ছে, আইনের প্রয়োগ সবার ক্ষেত্রে যেন সমান হয়।

সরকারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যখন একই সাথে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন এবং সরকারী দলের উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন, তখন শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান অবস্থাসহ দেশের সামগ্রিক আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দায়–দায়িত্ব কি তাঁদের পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব? এ দায়–দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপান যাবে না। বিরোধীদলের ভূমিকা থাকলেও, সরকারকেই এজন্য জবাবদিহি করতে হবে। অতএব, সরকারের দায়িত্ব যথাযর্থভাবে পালন না করে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস প্রতিকারে শুধু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোন ফল হবে না। ইতিমধ্যে তা প্রমাণিত হয়েছে। সরকার যদি সত্যি সত্যিই শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস প্রতিকার কামনা করেন, তাহলে নিজ ছাত্র সংগঠন থেকেই তা শুরু করতে হবে। তবে সরকারের অবস্থান সম্বন্ধে জনগণের আস্থা ও শ্রদ্ধা বাড়বে এবং সরকারী পদক্ষেপ ও জনমতের চাপে অন্যদের পক্ষে সন্ত্রাসী তৎপরতার আশ্রয় নেয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

সরকারের ভূমিকা মুখ্য হলেও একথা সত্যি যে, সরকারের একার পক্ষে সন্ত্রাস রোধ ও পরিস্থিতির উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে, সকল রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন, নাগরিক সংগঠন, সামাজিক সংস্থা ও অন্যান্যদের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করার আছে। রাজনৈতিক দলগুলোর উপলব্ধি করা উচিত যে, বিরোধী শিবিরে থাকাকালীন সন্ত্রাসী তৎপরতা প্রশ্রয় দিলে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তা বুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়। তবে শিক্ষা–প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে দল মতের উর্ধে থেকে পক্ষপাতিত্বহীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এটি নিশ্চিত করতে একদিকে যেমনি যোগ্য ও উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়া আবশ্যক, অন্যদিকে তেমনি তাঁদের জবাবদিহির ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

দেশের শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসী তৎপরতা ও দ্রুত অবনতিশীল পরিস্থিতি রোধে সরকারের মুখ্য ভূমিকা পালন করা দরকার। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং নাগরিকের জীবন ও সম্পত্তির নিশ্চয়তা বিধান প্রত্যেক সরকারের আশু দায়িত্ব ও কর্তব্য। পক্ষপাতিত্বহীন বা কোনরূপ বৈষম্য না করে সরকারকে এ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। অর্থাৎ এ জন্য প্রয়োজন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন বা সরকারী ছত্রচ্ছায়ায় অন্য কেউ অবৈধ অস্ত্র রাখলে, সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত হলে দোষণীয় কিছু নয়, কিন্তু প্রতিপক্ষের বেলায় তা বেআইনী, দোষণীয় হবে– এরূপ দ্বৈতনীতি একই সময় একই স্থানে চলতে পারে না। তাহলে, একদিকে যেমনি জনগণের দৃষ্টিতে সরকারের কৃতিত্ব নষ্ট হয়, অন্যদিকে তেমনি সরকারও তার শাসন করার আইনগত ও নৈতিক শক্তি হারায়।

পরিশেষে, সমাজ বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস দূরীকরণ সম্ভব নয়। দীর্ঘ দিনে সৃষ্ট এই সংক্রামক ব্যাধি সহসা নিরাময়ের নয়। তবে সম্মিলিত প্রয়াস ও প্রচেষ্টায় এর মাত্রা কমিয়ে আনা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা সর্বাধিক। সন্ত্রাসী তৎপরতা রোধে অবৈধ অস্ত্রের উৎসমূল চিহ্নিত ও তা বন্ধ করা অতি আবশ্যক। এটি যে কোন সরকারের পক্ষেই দুরূহ কাজ। তবে এজন্য থাকা চাই সরকারের সদিচ্ছা। ৫ মাসের মত হয় বিএনপি ক্ষমতাসীন হয়েছে। এত স্বল্প সময়ে সরকার সবকিছু ঠিকঠাক করে ফেলবে এরূপ আশা করাটা আদৌ বাস্তব সম্মত নয়। কিংবা, একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর সন্ত্রাস দূরীভূত হয়ে যাবে তাও ভাবা অযৌক্তিক। কিন্তু যা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হতে পারত তা হচ্ছে, সন্ত্রাস রোধে সরকারের সদিচ্ছার প্রমাণ। সরকার তা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। জাতির প্রত্যাশা, সরকার পদ্ধতি স্থির হয়ে যাওয়ার পর এখন বিএনপি সরকার শিক্ষাঙ্গনসহ সারাদেশের আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধনে সক্রিয় হবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ও বন্ধ হয়ে যাওয়া অন্যান্য শিক্ষা–প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ যথাশীঘ্র সম্ভব সেগুলো খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। কেননা, শিক্ষা–প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে থাকার বিষয় নয়, পরিস্থিতি যা–ই হোক না কেন।

ডঃ হারুন–অর–রশিদ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক।